বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র
দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংকলন
মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৯
দাম: ৫০ পয়সা

● দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা —একটি পর্য্যালোচনা—১
● অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫৫)—৫
● Science in India—A Myth or Reality—৮
● সংবাদ—১২ পুস্তক সমালোচনা—১৪ ● চিঠিপত্র—১৫

A pair of dreamy eyes, a bushy overhanging classical-looking moustache, a creased forehead,—if these have come to symbolise a person, then that person in turn has come to be a symbol of much that is noble, profound and lovable in man. We join with the rest of our fellowmen to pay our homage to Albert Einstien on this centenary year of his, because he added a new dimension not only to the world of physics but to the entire cultural world of mankind. May we progress to the better and harmonious future that he envisioned, and may we not be deterred by obstacles from creating that future.

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—একটি পর্য্যালোচনা

[A review of Damodar Vally Planning is presented highlighting the imbalances in different aspects of the planning. Author's criticised the adoptation of Tennessy Vally model and asserted that without an integrated approach towards upper and lower vally, without proper drainage channel in lower valley, afforestations and such other steps flood control will be a far cry.]

পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমরা এই অঞ্চলের বন্যাসমস্যার পেছনে গাঙ্গেয় অববাহিকার নিম্ন পশ্চিমাঞ্চলের নদনদীর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এই নদনদীকে ঘিরে নানা পরিকল্পনা কতটা দায়ী সেই আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। বন্যাসমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার গোড়ার কথা আমরা আগের নিবন্ধে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, এই পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে নদী বিশেষজ্ঞদের ও কমিটি, কমিশনের মতামত নিয়ে আলোচনা করব। (এরই সাথে ফরাক্কা প্রকল্প আলোচনা করতে না পারার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।)

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ঘোষিত উদ্দেশ্য: এই পরিকল্পনা এক বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হিসেবে প্রবর্তিত যার প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য হ'ল—(১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ; (২) বিদ্যুত উৎপাদন ; (৩) সেচব্যবস্থার

জন্য জল সরবরাহ। আর গৌন উদ্দেশ্যগুলি হ'ল মাটির ক্ষয়রোধ, জনস্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্য, মাছের চাষ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম। এই পরিকল্পনাকে দুটি পর্য্যায়ে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিক পর্য্যায়ের পরিকল্পনার মধ্যে আছে: (১) মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার ও তিলাইয়া এই চারটি বাঁধ নির্মান যার দ্বারা ১৯১৩ সালের রেকর্ড ২০" বৃষ্টিপাতের বন্যা (দশ লক্ষ কিউসেকের) নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই বাঁধগুলির মধ্যে মাইথন ও পাঞ্চেতের জলধারণ ক্ষমতাই হবে সবচেয়ে বেশি। দামোদর-বরাকরের সঙ্গমস্থলে বরাকর নদীর ওপর মাইথন ও দামোদরের ওপর পাঞ্চেত বাঁধ নির্মান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত ওপরের অংশে বরাকরের ওপর তিলাইয়া এবং কোনার নদীর ওপর কোনার বাঁধ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (২) বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে দু'ভাবে—তাপ ও জলবিদ্যুৎ। বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তাপবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে ১৫০ মেগাওয়াট আর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১৫০ মেগাওয়াটের কিছু কম বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। (৩) এমন একটি সেচব্যবস্থা থাকবে যা ১০ লক্ষ একর জমিতে বর্ষাকালে চাষের জল সরবরাহ করতে পারবে ও শুখা মরশুমে ৩০ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ করবে।

রূপায়িত দামোদর পরিকল্পনার কয়েকটি দিক: ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম পর্ব শেষ হল—দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় চারটি বাঁধ দেওয়া হ'ল (ভুরডাইনের প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল আটটি বাঁধের)। ১৯৫৯ সালের বন্যা ও পরবর্তীকালের ফি বছরের বন্যা সবশেষে গতবছরের বন্যা এই বাঁধগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হাজির করেছে। এই বাঁধগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কতখানি তা বুঝতে হলে বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা, কতটা বৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে কতটা জলপ্রবাহ হয়েছিল তা জানা প্রয়োজন। ১৯১৩ সালের ২০" বৃষ্টিপাতের জলপ্রবাহ ধরে বাঁধের জলাধারগুলির ডিজাইন করা হয়েছিল। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগ (১৮") দামোদরের শঙ্কুশীর্ষে এসে জমা হয় আর অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানা ছিল যে ৯" বৃষ্টিপাতের মোট জলপ্রবাহ বহন করার ক্ষমতা নিম্ন উপত্যকার আছে, অতএব বাদবাকী ৯" বৃষ্টিপাতের মোট জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনুযায়ী ডিজাইন করলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যথোপযুক্ত হবে বলে ধরা হয়েছিল। নিম্ন উপত্যকায় ২½ লক্ষ কিউসেকের বন্যার জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকায় তখনকার হিসেব অনুযায়ী ঐ পরিমাণ জল ছেড়ে দেওয়ায় কোন বিপদের ঝুঁকি ছিল না তাহলে বাদবাকী জল জলাধারে রাখলে সেচ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি খাতে এমনকি শুখার মরশুমে ও জল সরবরাহ করা যাবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ডিজাইন অনুযায়ী যে জলধারণ ক্ষমতা হওয়া উচিত প্রকৃত জলধারণ ক্ষমতা তার চেয়ে কম। নিচের তালিকা থেকেই আমরা তা দেখতে পাচ্ছি:

॥ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ॥ ১

জলাধার	জলধারণ ক্ষমতা	
	ডিজাইন অনুযায়ী	প্রকৃত
	১০^৩ একর ফুট (দশ লক্ষ ঘন মি)	
তিলাইয়া	১৪৪ (১৭৮)	১৪৪ (১৭৮)
কোনার	৪৫ (৫৬)	৪৫ (৫৬)
মাইথন	৪৪০ (৫৪২)	৩১২ (৩৮৪)
পাঞ্চেত	৮৮১ (১০৮৭)	৫৪০ (৬৬০)
	মোট ১৫১০ (১৮৬৩)	১০৪১ (১২৮৪)

প্রকৃত জলধারণ ক্ষমতা ডিজাইনের ক্ষমতার চেয়ে কম হওয়ার বন্যা সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। মাইথন আর পাঞ্চেত যে দুটি বাঁধ মুখ্য বন্যা নিরোধী বাঁধ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল তাদের ডিজাইন অনুযায়ী একত্রে ১·৩২১ মিলিয়ন একর ফুট জলধারণ ক্ষমতা থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ০·৯৮৪ মিলিয়ন একর ফুট। ৫৩·৩ লক্ষ একর ফুট জল ধরে রাখতে পারে এরকম আটটি বাঁধের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভুরডাইন। পরে যে চারটি বাঁধ দেওয়া হ'ল সেখানে মোট জলধারণ ক্ষমতা সংশোধন করে বলা হল ২৯ লক্ষ ৩ হাজার একর ফুট—কিন্তু বাঁধ তৈরির সময়ই ধারণ ক্ষমতা ১৫ লক্ষ ১০ হাজার একর ফুটে নামিয়ে আনা হয়। বাঁধ তৈরির পঁচিশ বছর পরে পলি জমে জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার একর ফুট—ফলে এখন জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রস্তাবিত ক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ! এদিকে বর্ষার সময় যখন একসাথে অনেক জল উপর থেকে নামে তখন বাঁধগুলো থেকে যা জল ছাড়ে তার সাথে নিম্নউপত্যকার বৃষ্টির জল একত্রিত হয়ে চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবার শুখা মরশুমে জলাধারের জল সেচখাল দিয়ে, পাঠিয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজের নিচে ছিটেফোটা জল আসাও বন্ধ করে দিয়েছে তার কুফল আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। বহুমুখী এই নদী পরিকল্পনার সেচব্যবস্থায় জল সরবরাহের দিকটায় একবার তাকান যাক।

সেচব্যবস্থায় জল সরবরাহ: চারটে বাঁধ তৈরি হওয়ার পর সরকারী প্রতিশ্রুতি ছিল দশ লক্ষ একর জমিতে সারাবছর চাষের জল দেওয়ার। দেখা যাক খরিফ ও রবি শস্য চাষের জন্যে দশ লক্ষ একর জমিতে কত জল লাগে। খরিফ শস্যের জন্য সেচের জল লাগে ৯০ একরে এক কিউসেক সাড়ে চার মাস ধরে, অতএব দশ লক্ষ একরে ১১,০০০ কিউসেক (প্রায়), তাহ'লে সাড়ে চার মাসে মোট জল লাগবে ১১০০০ × ৪½ × ৩০ × ·৪ × ৬০ × ৬০ ঘনফুট = ৪৯,৫০০ ক ঘনফুট (ক = ৩০ × ২৪ × ৬০ × ৬০) আবার রবি শস্য চাষের জন্য সেচের জল লাগে ২০০ একরে এক কিউসেক সাড়ে চার মাস যাবৎ, অতএব দশ লক্ষ একরে জল লাগবে ৫০০০ কিউসেক, তাহলে সাড়ে চার মাসে মোট জলের পরিমাণ =

৫০০০ × ৪½ × ৩০ × ২৪ × ৬০ × ৬০ = ২২৫০০ ক ঘনফুট। সুতরাং সেচের জন্য সারাবছরে জল লাগবে (৪৯,৫০০ ক + ২২,৫০০ ক) ঘনফুট = ৭২০০০ ক ঘনফুট = ১৮৬৬ × ১০⁸ ঘনফুট। এদিকে চারটে বাঁধের জলাধারে প্রস্তাবিত জলধারণ ক্ষমতা ছিল ২৯ লক্ষ ৩ হাজার একর ফুট অর্থাৎ ১০৭৮ × ১০⁸ঘনফুট। তাহলে দেখা যাচ্ছে জলাধারের মোট জলের তুলনায় সেচের জন্য জল সরবরাহের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন জলাধারের জলের পরিমান দাঁড়িয়েছে এক তৃতীয়াংশ। কেবলমাত্র যদি খরিফশস্য চাষের জন্য জল ছাড়া হয় তাহলে ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার একর ফুট জলে সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে চাষের জল সরবরাহ করা যাবে। এ ছাড়া রবিশস্য, তাপ ও জলবিদ্যুত প্রকল্পের জল শিল্পের জল কোথা থেকে আসবে? তাহ'লে বাঁধের জল শুখার মরশুমে ছিটেফোটাও পাওয়া যাবে না। কুমুদভূষণ রায়ের হিসেব অনুযায়ী[২] বর্ষার মরশুমে দামোদরে বাহিত জলের পরিমাণ = ১৪০০০ × ১২ × ৩০ × ২৪ × ৬০ × ৬০ ঘনফুট (গড়ে বার্ষিক জলপ্রবাহ হ'ল ১৪০০০ কিউসেক)। মোট জলের পরিমাণ তাহলে দাঁড়াল ১৬৮০০০ ক ঘনফুট (ক = ৩০ × ২৪ × ৬০ × ৬০)। সেচখালে ব্যবহৃত মোট জলের পরিমাণ ৭২০০০ ক ঘনফুট। তাহলে বর্ষাকালে দুর্গাপুর ব্যারেজের নিচে নিম্ন দামোদরের জলপ্রবাহের মাত্রা = $\frac{১৬৮০০০ক - ৭২০০০ক}{১২ক} = ৮০০০$ কিউসেক। অন্যদিকে শুখার মরশুমে দুর্গাপুর ব্যারেজের নিচে নিম্ন দামোদরের প্রবাহমাত্রা = $\frac{৭২০০০ ক - ৭২০০০ ক}{১২ ক}$ = শূন্য। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে শুখার মরশুমে জলাধার থেকে এক ফোঁটা জলও নিম্ন দামোদরে প্রবাহিত হয় না যার ফলে নিম্ন দামোদরের নদীগুলির চূড়ান্ত অবনতি ঘটে চলেছে —নিচ থেকে উঠে আসা পলি সাগরে নিয়ে ফেলার মত জল পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত মজে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলে জল বাহ ২½ লক্ষ কিউসেকের পরিবর্তে ষাট হাজার কিউসেকে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলে যে খরিফশস্য চাষের জন্য ৮'৪৫ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হবে আর শিল্পে ব্যবহারের জন্য সেচের জল কমিয়ে রবি শস্যের জন্য ৫৫০০০ একর জমিতে জল সরবরাহ করবে। এখন এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এত বেশি জমিতে জল সরবরাহ করা জলাধারগুলির পক্ষে সম্ভব না কারণ তা হলেও নিম্ন দামোদরের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হত না। শুধু সেচখাল দিয়েই ত' জল ছাড়া হয় না বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও জল সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থাটা কি একবার দেখা যাক।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ জলাধার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা হ'ল বর্ষার সময় জলবিদ্যুতের উৎপাদনে জোর দেওয়া হয় আর শুখার সময় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে এবং জল ও তাপ বিদ্যুতের আনুপাতিক হার ৭০ : ৩০ রাখা হয়। কিন্তু ডিভিসির বিদ্যুৎ উৎপাদনে তাপ বিদ্যুতের মোট পরিমাণ ১১৯৭'৫ মেগাওয়াট আর জলবিদ্যুতের পরিমাণ ১০৪ মেগাওয়াট যার থেকে জল ও তাপবিদ্যুতের অনুপাত দাঁড়ায় ৮ : ৯২। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যে আছে ৫২০ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুত ও ৪০ মেগাওয়াটের জল বিদ্যুত।[৩] জলবিদ্যুত অনেক কম খরচে পাওয়া সত্ত্বেও তাপবিদ্যুত উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়াটা সম্ভবত বিদেশী শক্তিগুলোর ওপর চূড়ান্ত নির্ভরশীলতারই একটি নজীর। বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে বিদ্যুত উৎপাদনেই ব্যয় হয় মোট ব্যয়ের শতকরা আশি ভাগ, আর এর মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে। ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ লালের হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হ'ল বিদ্যুৎ—২১২'৭৯ কোটি টাকা; সেচব্যবস্থায় ৪৬'৫৮ কোটি টাকা ও বন্যানিয়ন্ত্রণে ১৯'১২ কোটি টাকা।[৪]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার বন্যার জল নিয়ন্ত্রন ও তার সাথে সেচখালে জল সরবরাহে এবং তাপ ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে যে বিরোধটা ফুটে উঠছে তা এই পরিকল্পনাকে একটি সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য ত করছেই না উপরন্তু সমস্যার ওপর সমস্যার বোঝা চেপে একটি সংকটের চেহারা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা কতখানি কল্যানজনক তাই নিয়ে যে বিতর্ক বিশেষজ্ঞ মহলে এবং সাধারণের মধ্যে উঠেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আমরা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

সেচ বিদ্যুৎ আর শিল্পে জলসরবরাহ করে জলাধার থেকে শুখার সময়ে এক ফোটা জলও ছাড়া সম্ভব হয় না বলেই নিম্ন দামোদরে সাগর থেকে উঠে আসা পলি সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না আর নদীগুলি দ্রুত পলি পড়ে মজে যায়। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বেশ কয়েকজন নদীবিজ্ঞানী। রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ এন, কে বসুর মতে "বছরের পর বছর উচ্চ উপত্যকার জল এসে নিম্ন দামোদরকে ধৌত না করলে এই অঞ্চলে বন্যার তীব্রতাও অনেক বেড়ে যাবে।"[৫] আমরা আগের সংখ্যায়ও উল্লেখ করেছি যে ডিভিসির বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে (১) হুগলী নদীর খাতে জোয়ারের জলে প্রবেশ করায় হুগলী পয়েন্টের উত্তরে নদীর নাব্যতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, (২) নিম্ন দামোদর ও দ্বারকেশ্বরে জল নিকাশী পথ না পেয়ে আন্তর্দামোদর ও আরামবাগ প্লাবিত হবে এবং জল নেমে যেতেও অনেক দেরি হবে, (৩) দাসপুর অঞ্চলে রূপনারায়ণ, শিলাই, পলাসপাই ইত্যাদি দু' চারটি খাল দিয়ে সীমিত থাকার ফলে এই অঞ্চলও প্লাবিত হবে।

শ্রীযুক্ত কুমুদভূষণ রায়ের মতে উপরের অঞ্চল থেকে নিম্ন দামোদরে কোন জলপ্রবাহ না থাকলে দামোদর একটি বিশুদ্ধ জোয়ার ভাঁটার নদী হয়ে দাঁড়াবে এবং অতি দ্রুত পলি পড়ে মজে যাবে।[৬] জোয়ার ভাঁটা খেলা নদীর বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, যে পরিমাণ জল জোয়ারের সাথে ঢোকে সেই

পরিমাণ জলই ভাঁটার সাথে ফিরে যায়, জোয়ারের জলের গতি ভাঁটার জলের গতির চেয়ে বেশি হওয়ার ফলে জোয়ারের সাথে যে পরিমাণ পলি ওপরের দিকে আসে তার চেয়ে কম পরিমাণ পলি ভাঁটার টানে ফিরে যায় এবং পলি পড়ে নদীখাত মজে যায়। শুখার সময়ে নিম্ন দামোদর অঞ্চলের জল না আসার দরুণ এই নিম্ন দামোদরের ক্রমাবনতি ঘটে চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আড়াই লক্ষ কিউসেকের সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা বর্তমানে ৬০,০০০ কিউসেকে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে প্রতি ১২ বছরে পাঁচ বছর শুখার প্রাধান্য থাকে অতএব নদনদীর অবস্থা প্রকৃত নদীশাসন ছাড়া কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযুক্ত কপিল ভট্টাচার্য মনে করেন হুগলী নদীতে সাগর থেকে উঠে আসা ঝোলানো পলির সঙ্গে পলিমঞ্চ থেকে নদীর গা বেয়ে লাভার মত একধরনের পলি নিম্নদামোদর ও রূপনারায়ণের ঘাটাল অবধি উঠে আসে। ভাগীরথী, মেঘনাও এই অঞ্চলের নদীগুলি বন্যার সময় সাগরের উপকূল মঞ্চে পলি ফেলে এই পলিমঞ্চের সৃষ্টি করে। সারা বছর বঙ্গোপসাগরের উপকূল মঞ্চ থেকে জোয়ারের সময় ১৪ থেকে ২০ লক্ষ কিউসেকর জলপ্রবাহে বিশাল পরিমাণ পলি হুগলী ও তার উপনদীতে বাহিত হয়ে আসে এবং অপেক্ষাকৃত কম গতিসম্পন্ন ভাঁটার সময় এই পলির অধিকাংশই নদীবক্ষে সঞ্চিত হয়ে চরের সৃষ্টি করে। দামোদর-মুণ্ডেশ্বরী-রূপনারায়ণ-এর ঢাল ভাগীরথী হুগলীর ঢালের থেকে বেশি হওয়ায় নিম্নদামোদরের অধিকাংশ জল এই খাতে প্রবাহিত হয়ে বন্যার সময় প্রচণ্ড ভরবেগে নিম্নহুগলীর পলির চর কেটে বঙ্গোপসাগরে ফেলে নদীর নাব্যতা রক্ষা করতে সাহায্য করত। কপিলবাবুর মতে দামোদরের বন্যা নিরোধী বাঁধগুলিই এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বন্ধ করেছে যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে হুগলী নদীর নাব্যতা এবং কলকাতা বন্দরের কার্যকারিতা অনেকাংশেই ধ্বংস হচ্ছে।[৭,৮] তাঁর মতে দামোদর পরিকল্পনার সংস্কার করে রূপায়ণ করতে না পারলে বছরের পর বছর এই দুর্দশা বেড়েই যাবে। দামোদর পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ ও নাব্যতা এবং সেচের ব্যবস্থার পরস্পর বিরোধীতা তিনি জোরের সাথে তুলে ধরেন এবং তিনি মনে করেন দামোদর পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ অবদান হতে পারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজকে অত্যন্ত কম গুরুত্বের সাথে দেখাকে তিনি ভারতবর্ষের পরনির্ভরশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর চরিত্র হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। দামোদরের বন্যাসমস্যার সমাধানকল্পে একটি খসড়া প্রস্তাবও পেশ করেছেন।

আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে দামোদরের বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন এবং আর একটি বাঁধ নির্মান করে বন্যা-সম্ভাবনাকে কমানো যেতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এঁরা দামোদরের পরিকল্পনার সংস্কার চাইছেন। একটি, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা মূলত সঠিক এবং কিছু সংস্কারমূলক কাজ যেমন জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোও বাঁধের সংখ্যা বাড়িয়ে জলধারণ আরও বাড়ানো যাতে বর্ষার সময় জল ছাড়া সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অপর দৃষ্টিভঙ্গীটি, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্যই ত্রুটিপূর্ণ এবং বন্যাসম্ভাবনাকে কমাতে হলে নিম্নদামোদরের জলনিকাশী ব্যবস্থারও উন্নতি বিধান করতে হবে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি নিঃসন্দেহে নদনদী ব্যবস্থার সামগ্রিক বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনেক বেশি সঠিকতা দাবী করতে পারে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পরও বন্যার তীব্রতা কমে নি বরং বেড়েই চলেছে—এই নিয়ে বেশ কিছু বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে কিছু কমিটিও নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য ও সংস্কারের পথ সুপারিশের জন্য। ১৯৫৯ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফ্লাড এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট থেকেও দেখা যায় যে ডি ভি সির বাঁধ তৈরি হওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলের বন্যাসমস্যার তীব্রতা বেড়েছে এবং বাঁধগুলি থেকে জলছাড়ার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রূপনারায়ণ, মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বরের মত গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির উন্নতি সাধন ও জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ইত্যাদি ছিল আন্তর্দামোদর এলাকার জন্য এই এলাকার সুপারিশ।[৯] ১৯৫৯ সালে অগমেনটেশন অফ ওয়াটার রিসোর্সেস অফ ডিভিসি (ডিঃ-১৯৫৯) এই অঞ্চলের সমস্যাগুলোর মধ্যে আমতা খাল, দামোদর ও শাখানদীগুলির সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে আর একটি বাঁধের (আয়ার বাঁধের) পরামর্শ দেয়।[১০] পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করা সত্ত্বেও ইউ এন ইকনমিক কমিশন-এর ফ্লাড কন্‌ট্রোল ব্যুরো দামোদর উপত্যকা অনুসন্ধান করে আয়ার বাঁধ নির্মানের সুপারিশ করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আয়ার বাঁধ (বর্তমানে তেনুঘাট) মোটেই বন্যাবিরোধী বাঁধ নয়; ভাবা হয়েছিল এই বাঁধের জল দিয়ে পাওয়ার প্ল্যান্ট পুরোপুরি চালু করা যাবে ও বোকারো ইস্পাত কারখানাও সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থায় এবং সেচের জল সরবরাহ করা যাবে কিন্তু তেনুঘাট থেকে কেবলমাত্র বোকারোতেই জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।[১১] ১৯৭১ সালে শ্রীনিবাস রাও কমিটি লক্ষ্য করে যে জলনিকাশী ব্যবস্থার দ্রুত অবনতির ফলে আড়াই লক্ষ কিউসেকের জায়গায় ৬০,০০০ কিউসেক বন্যাই নিম্নাঞ্চলকে প্লাবিত করছে এবং এই কমিটির প্রতিবেদনে বলপাহাড়ীতে বাঁধ নির্মানের কথা বলা হয় এবং এই অভিমতও ব্যক্ত করে যে মাইথন পাঞ্চেতে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ালেই হবে না জলনিকাশী ব্যবস্থাও উন্নত করতে হবে। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি (লোয়ার দামোদর কমিটি নামে পরিচিত) সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মাফিক মাইথন ও পাঞ্চেতের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো; আমতা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে দামোদরের

বন্যার একটি বড় অংশ প্রবাহিত করানো (কমিটির অন্যতম সদস্য দেবেশ মুখার্জীর মতে দামোদরের বন্যাপ্রবাহ আমতা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ১/৩ অংশ পাঠানো প্রয়োজন) এই কমিটির মতে উচ্চ অববাহিকায় আরও বাঁধ তৈরি হলে রূপনারায়ণের খাতের ক্রমাবনতি এই অঞ্চলের বন্যাসমস্যা আরও তীব্র করে তুলবে। মানসিং কমিটির সাথে সহমত পোষণ করে এই কমিটিও দামোদর-মুণ্ডেশ্বরী-রূপনারায়ণের খাতের জলনিকাশী ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ড্রেনিং ও ড্রেজিং প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়।[১২]

বন্যার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নানা রিপোর্ট নানা দাওয়াই বাতলেছে (যেমন বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, বাঁধ নির্মাণ, নিম্ন-দামোদরের জলনিকাশী ক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি), কিছু কিছু কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে (যেমন বলপাহাড়ীতে বাঁধ নির্মাণ এবং মাইথন ও পাঞ্চেতের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো), কিন্তু বন্যাসমস্যা সমাধানের বিষয়টি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে।

যে টেনেসি নদী পরিকল্পনার অন্ধ অনুকরণে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই টেনেসি নদীকে কোনোমতেই দামোদরের সাথে তুলনা করা চলে না—কারণ এই নদীর মূল তফাৎ হল টেনেসী নদী মোহনার বদ্বীপের কাছে প্রবাহিত হয় না কিন্তু দামোদর কেবল প্রবাহিত হয় তাই নয় একে বদ্বীপের অংশবিশেষও বলা চলে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল ত্রুটি হ'ল দামোদর নদের বৈশিষ্ট্যকে (বদ্বীপ অঞ্চলের নদী) যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে টেনেসী নদী পরিকল্পনাকে অনুকরণ করা। দ্বিতীয়তঃ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ল তাও পুরোপুরি কার্যকর করা হল না বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশ্ন অবহেলিত থেকে গেল। এমনকি এই পরিকল্পনাকেও একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে—উচ্চ উপত্যকায় বাঁধ দিলে নিম্ন উপত্যকায় তার ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে তাও বিচার করা হয় নি। এই অঞ্চলের বন্যা নিরোধের জন্য নদনদীর জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের, বিভিন্ন অঞ্চলে জলমগ্নতার সমস্যার সমাধানের উচ্চ উপত্যকার ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য এবং পরিকল্পিত বনসৃষ্টিকরণের প্রয়োজনীয়তা আজও অবহেলিত থেকেছে। সর্বোপরি দামোদর পরিকল্পনা যদি একটি সঠিক দিশা খুঁজে না পায়, যদি পরস্পর বিরোধী প্রকল্পগুলো (যেমন সেচব্যবস্থার জন্য জলসরবরাহ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অপরদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ) একই সাথে চলতে থাকে, যদি নিম্ন-দামোদরের জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি না হয় তা হ'লে এই বন্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চিন্তাও হবে আর একটি কল্পনাবিলাস মাত্র।

অমল সোম
পার্থ সেন
কুমারেশ মিত্র

সূত্রপঞ্জী ঃ

১। স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যাণ্ডবুক : ডি ভি সি ১৯৭৪-৭৫

২। দি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন—উইল ইট এচিভ ইটস্ এইম ?—কুমুদভূষণ রায়

৩। স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যাণ্ডবুক : ডি ভি সি ১৯৭৪-৭৫

৪। ঐ

৫। দ্য ভাগীরথী হুগলী এ ফিউ রিমার্কস : এন, কে, বোস (দ্য ভাগীরথী হুগলী বেসিন : সম্পাদিত কাননগোপাল বাগচী, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২)

৬। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন—উইল ইট এচিভ ইটস এইম ?—কুমুদভূষণ রায়।

৭। বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা : কপিল ভট্টাচার্য্য (বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৫৯)

৮। কলকাতা-হলদিয়া বন্দর ও ফরাক্কা প্রকল্প : কপিল ভট্টাচার্য—বারোমাস-আগষ্ট, ১৯৭৮

৯। ফাইনাল রিপোর্ট অফ দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফ্লাড এনকোয়ারী কমিটি, ১৯৫৯—ভল্যু ১ (রিপোর্ট) : গভর্মেণ্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইরিগেশন এণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেণ্ট

১০। এ কেস স্টাডি অফ দি ডি ভি সি এণ্ড ইটস প্রোজেক্টস : (ফ্লাড কনট্রোল সিরিজ নং ১৬)—ইউ এন ইকনমিক কমিশন ফর দি এশিয়া এণ্ড দি ফার ইষ্ট, ব্যাংকক ১৯৬০

১১। রিপোর্ট অফ দি কমিটি ফর দি অগমেনটেশন অফ ওয়াটার রিসোর্সেস : ডি ভি সি : ভল্যু ১ ডিসেম্বর ১৯৫৯

১২। দি স্টেটসম্যান—২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৮

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫৫)

এক ভদ্রলোক আইনস্টাইনকে একবার আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের অতি আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলে আইনস্টাইন উত্তরে বলেন তাঁর ধারণা পদার্থবিদদের চেয়ে এই তত্ত্ব নিয়ে পাদরীকুলের আগ্রহই বেশী। রসিক আইনস্টাইন ভদ্রলোককে বিস্ময়াহত করে আরো ব'ললেন "কারণ আর কিছুই নয়, পাদরীরা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে আগ্রহী, পদার্থবিদরা প্রায়শই নন"।[১]

কথাগুলো হয়তঃ হালকাভাবেই বলা, তবুও একথা সত্য যে আজকের বিজ্ঞানের অসংখ্য বিভাগের যে কোন একটায় গবেষণারত একজন সাধারণ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলো সম্বন্ধে ধারণা রাখা বা গবেষণা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে আমরা বাস করি সেখানে সহজে হাততালি কুড়োবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের বিজ্ঞানের একীকরণের বদলে আরো বেশী বিভাজনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ভুলে যাই সাধারণ নিয়মগুলোর কথা, বিশেষ বিশেষ নিয়ম নিয়েই আমাদের যতো মাথা ব্যথা।

বৈজ্ঞানিক অবদান ঃ অথচ আইনস্টাইনের জীবন ও কাজে আমরা দেখি ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া—বিজ্ঞানের জগতে সংক্ষিপ্তকরণ আর একীকরণের ক্ষেত্রে যিনি সর্বাপেক্ষা সফলকাম তিনিই—এলবার্ট আইনস্টাইন। আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে "স্বাবিয়েন ইহুদি" পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম। জুরিখের Federal Institute of Technology-তে তাঁর পড়াশুনা যখন অত্যন্ত সাদামাটাভাবে শেষ হয় তখন কেই বা জানত ভবিষ্যৎ। বার্ন-এর এক পেটেন্ট অফিসে কলম পেসার অবসর সময়ে তাঁর মন জুড়ে থাকত পদার্থবিদ্যার মূল না জানার প্রশ্নগুলো। প্রশ্ন অবশ্য তাঁর মনে অনেক আগেই জেগেছিলো ১৭ বছর বয়সে সনাতনী বলবিদ্যার মূল বক্তব্যের সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের অসামঞ্জস্য নিয়ে। ফলশ্রুতি ১৯০৫ সালের তাঁর গবেষণা পত্রটি —Electrodynamics of moving media। এতেই ছিল আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথাগুলো, যা দেশ-কাল সম্পর্কে ধারণাকে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে গেলো। আপেক্ষিকতাবাদের বিস্ফোরণের কারণ এবং সময় জানতে হলে সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক অচলাবস্থাকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। ফ্রেনেল আলো বলতে বুঝিয়েছিলেন ইথারে এক ঢেউ। মাইকেলসন তাঁর ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে দেখালেন এ ধারণা ভুল। প্রশ্ন উঠলো, তবে আলো কি? ফিটজারাল্ড বললেন গতিময় বস্তুর দৈর্ঘ কমে যাবে ইথারের মধ্যে চলাকালে। লরেঞ্জের বক্তব্য, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় সমীকরণ অনুসারে সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভুল। ঠিক এই অগ্নিগর্ভ সময়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলতে পারা যায় "সর্ব-রোগ-হর" তত্ত্ব। এর ভিত্তি, আলোর গতিবেগ যেখান থেকে যে অবস্থায় মাপা হোক না কেন সব সময় সমান। উল্টে গেলো আমাদের সময় আর দূরত্বের ধ্যানধারণা। এখন আর চূড়ান্তভাবে স্থির কেউ নয় সবাই ছুটছে। বিশ্ব প্রকৃতির এই গতিময় রূপকে আমরা নতুন করে চিনলাম। ১৯০৫ সালে শুধু আপেক্ষিকতাবাদ নয় আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়ার সঠিক সমীকরণ তিনি উপস্থাপন করলেন। দেখালেন, বস্তু কণিকা কর্তৃক আলোর শোষণ আর বিকীরণ হয় কণারূপে। বলা যেতে পারে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এখান থেকেই শুরু। সময়ের নতুন ভিত্তি ভরের অপরিবর্তিত রূপটাও পালটে দিলো। গতি বাড়ার সঙ্গে ভরও বাড়তে লাগলো, আর মানুষ পেল বস্তুরমধ্যে অযুত শক্তির সন্ধান তাঁর বিখ্যাত $E=MC^2$ সমীকরণ থেকে।

এই সংক্ষিপ্তকরণ আর একীকরণের চেষ্টা চলেছে তাঁর জীবনভর। ১৯১৫ সালের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে চলেছে, চলেছে শেষ বেলায় ১৯৫০ সালে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে, যে কোন তত্ত্বের সঠিকতা নির্ভর করে তার যুক্তিবিন্যাস বা আপাতমাধুর্যের উপর নয়, তা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় কি না তার উপর। চরম তাত্ত্বিক হয়েও আইনস্টাইন এই সত্যকে যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তা বোঝা যায় তাঁর ১৯১৮ সালের সেই বিখ্যাত উক্তি থেকে "মধ্যাকর্ষণ বিভব দ্বারা যদি বর্ণালী রেখার সরণ না হয় তবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ভুল বলে প্রমাণিত হবে"[২]। এই উক্তির অনেক বছর পরে সাইরাস নক্ষত্রের সঙ্গীর বর্ণালী রেখার লোহিত সরণ ধরা পড়ে। এই বস্তুবাদিতাই আইনস্টাইনের বিজ্ঞান সাধনার মূল চালিকা শক্তি।

দর্শন ঃ যদিও আইনস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্বের আধার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নয় তথাপি আইনস্টাইনের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবুও বিংশ শতাব্দির বিস্তৃত সময় জুড়ে দক্ষিণ, বাম বিভিন্ন পন্থার বক্তারা তাঁকে কখনও বা নিজেদের দলের বলে কখনও বা চক্রান্তকারি বলে আখ্যা দিয়েছেন। আইনস্টাইন নিজে এ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন তা নয়, যথাসময়ে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন কখনও বা রাখেননি। এই বিজ্ঞান তপস্বী তর্ক এড়িয়ে বেশীরভাগ সময়ে নিজেকে ব্যপৃত রেখেছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণায়।

আপেক্ষিকতাবাদের চোরাবালীতে অনেকেই ডুবেছিলেন না বুঝে ; ভুল

কথা অনেকেই বলেছেন। বিখ্যাত ভাববাদি দার্শনিক হেনরী বার্গসন তো বলে বসলেন—আপেক্ষিকতাবাদ একটা বিরাট গাণিতিক জালিয়াতি। আর্থার এডিংটন বা জেমস জীনসের পদার্থ বিদ্যার পাণ্ডিত্য অস্বীকার না করেও বলা যায়—আপেক্ষিকতাবাদকে সর্বব্যাপী আপেক্ষিকতা ধর্মের ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁরা অবক্ষয়ী আদর্শের যে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন একে ডারউনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে সামাজিক ব্যাধি প্রকট হয়েছিলো····যাকে আমরা Social Darwinism নামে জানি—তারই সাথে তুলনা চলে।

তবে সবচেয়ে গুরুতর আক্রমণ এসেছে বোধহয় ফিলিপ ফ্রাঙ্ক এর কাছ থেকে যাকে আইনস্টাইনের বিজ্ঞান দর্শনের উপর একজন বিশেষজ্ঞ বলে মানা হয়। ফ্রাঙ্কের যুক্তি অনেকটা এই রকম: 'আইনস্টাইন মাখের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন, লেনিন মাখের উপর ছিলেন খড়্গহস্ত তাই লেনিন আইনস্টাইন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, এবং এই জন্যই রাশিয়ায় আপেক্ষিকতাবাদের অনাদর ছিলো।' এহেন যুক্তিজাল শুধু এই মিথ্যাকে প্রমাণ করবার জন্য, যে সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞান এগোতে পারে না, তা অস্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফ্রাঙ্ক-এর এই মিথ্যাচার ভাঙতে আর কারও নয় আমাদের স্বয়ং আইনস্টাইনের দ্বারস্থ হতে হবে—তার আগে বলে রাখা ভাল যে ফ্রাঙ্কের কথা অনুযায়ি আপেক্ষিকতাবাদ রাশিয়ায় পড়ানো বন্ধ তো হয়ই নি, বরং বিপুল উৎসাহ সেখানে তার চর্চা হয়, যার জলন্ত উদাহরণ বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যান—তিনিই প্রথম ১৯২২ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের মডেল উপস্থিত করেন—এই কাজ সম্পর্কে আইনস্টাইনের বক্তব্য, "এই গণিতবিদ গোলক ধাঁধা হতে বের হবার এক সুন্দর উপায় বের করেছেন—এবং হাবল এর প্রসারণশীল তারামণ্ডলের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাজুয্য"[৩]। মাখ্ এর কথা আইনস্টাইনের বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা করতে গেলে বার বার আসবে—কারণ আইনস্টাইন মাখ্-এর History of Mechanics এর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন। যে ভুল বার বার হয়ে এসেছে তা আইনস্টাইনের এই স্বীকারোক্তির সঠিক ভিত্তি রূপায়ণের অসার্থকতায়। মাখ্-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছেই আইনস্টাইন ঋণী—তাঁর মতে আপেক্ষিকতাবাদের বীজ সুপ্ত ছিলো মাখের চিন্তাধারায়। মাখ্ই একমাত্র বৈজ্ঞানিক যাঁর সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধিয় ধারণা পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে সঠিক ছিলো। আইনস্টাইন এই ঋণের কথাই স্বীকার করেছেন। মাখের অভিজ্ঞেয়তাবাদী চিন্তাধারায় আইনস্টাইনের বিশ্বাস প্রথম দিকে কিছুটা থাকলেও পরে তা একদম চলে যায়। "আমার যৌবনে মাখের জ্ঞানতত্ত্ব আমাকে প্রভাবিত করলেও—আজ আমি সে অবস্থানের সঙ্গে একমত নই।"[৪]

বস্তুবাদীর মূল আস্থা চেতনার বাইরে যে জগৎ তার অস্তিত্বের উপর। 'ম্যাক্সওয়েলের প্রভাব' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আইনস্টাইন লিখছেন—"মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন বাইরের বিশ্বজগতের অস্তিত্ব, বিজ্ঞানের মূল স্তম্ভ। ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষভাবে খবর দেয়। তাই বিশ্বজগৎকে বোঝা নির্ভর করে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করা অনুমানের উপর"। আইনস্টাইনের বিজ্ঞান দর্শন যেরকমভাবে বিভিন্ন সময়ে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছে তেমনি করেছে তাঁর সামাজিক আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

মানবতাবোধ ও সমাজচেতনা: যদিও আইনস্টান প্রত্যক্ষভাবে কখনও রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াননি তবুও যেখানেই তিনি দেখেছেন মানবতার শঙ্কা সেখানেই বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর এই দিকের প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ সালে যখন একমাত্র তিনি এবং তাঁর বন্ধু ফ্রেডরিক্ নিকোলাই প্রতিবাদ করেছিলেন তৎকালীন জার্মান বুদ্ধিজীবিদের প্রকাশিত "Manifesto of the Civilised world" এর-এটার মধ্যেই যে ভবিষ্যৎ ফ্যাসিজমের বীজ অঙ্কুরিত ছিল তা এড়াইনি আইনস্টাইনের শ্যেন চক্ষু। এই দৃঢ়তা ও সচেতনতা তাঁর বজায় ছিল ১৯৫৫ সাল অবধি। তাঁর মৃত্যুর ছয়দিন আগেই তিনি এবং রাসেল প্রকাশ করেন বিখ্যাত রাসেল—আইনস্টাইন ম্যানিফেস্টো। এখন আর একা নয়, সঙ্গে ছিলেন—জলিও কুরি, ম্যাক্স বর্ণ, ইউকাওয়া, পাউলিং প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

কোরিয়া যুদ্ধের উপর আইনস্টাইনের বক্তব্য তাঁকে একা করে ফেলেছিলো আমেরিকানদের থেকে। তিনি লিখলেন, "আমি বলব আমেরিকাই রাশিয়ার তুলনায় বড় বাধা বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে। এই যুদ্ধ কোরিয়াতে, আলাস্কায় নয়—রাশিয়ার বিপদ অনেক বেশী। আমি বুঝি না এখানকার লোকেরা কি করে এই গল্প বিশ্বাস করেন যে আমরা আশঙ্কার মধ্যে আছি। মনে হয়, এর কারণ একমাত্র রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা। এবং সবাইকে এটা বোঝানোর চেষ্টা চলছে, যেন রাশিয়াই আক্রমণকারী।"[৫] যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা আইনস্টাইন বলেছিলেন তা তাঁর মধ্যে তখন যে কি চূড়ান্ত রূপে পরিমার্জিত হয়েছিল সেটা ভাবলে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। ১৯৫৫ সালে ২ জানুয়ারী তারিখে লেখা একটা চিঠিরকিছু অংশ দেখা যাক "আমার শেষ পিতৃভূমি (আমেরিকা) নিজের প্রয়োজনে এক নয়া ঔপনিবেশের ধারা আবিষ্কার করেছে যা ইউরোপের পুরোন ঔপনিবেশিকতা থেকে অনেক সুক্ষ্ম। আমেরিকান পুঁজি বিদেশে এরা এমনভাবে লগ্নীকরে যে ওই দেশ আমেরিকার কাছে বাঁধা পড়ে। যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে তাকেই আমেরিকার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই অবস্থাকে মনে রেখেই আমি আজকের রাজনীতি বোঝবার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় এটা যতটা না কারও মস্তিস্ক প্রসূত তার থেকে বেশি উদ্ভূত বর্তমান অবস্থার প্রাকৃতিক ফল স্বরূপ·····"।[৬]

অথচ এই যদি আইনস্টাইনের চিন্তাধারা হয় তবে যে ভুল এতক্ষন আমরা দক্ষিনপন্থী দার্শনিকদের হয়েছিলো বলেছি তা কেন বামপন্থীদেরও হবে? কিন্তু ইতিহাস নিষ্ঠুর। আমরা জানি ১৯৪৭-এ লেখা রুশ পদার্থবিদদের চিঠি যেখানে তাঁরা লিখছেন—"আপনি কি বুঝতে পারছেন না আপনার চিন্তাধারা কি করে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদিদের হাত শক্ত করছে কি করে আপনি ওদের সেবাদাসে পরিণত হচ্ছেন?"[৭] আইনস্টাইন এই চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা যে যথাযথ ছিল তার সাক্ষী আজকের ইতিহাস। রাজনীতি বা অর্থনীতির বিধিবদ্ধ শিক্ষা না থাকলেও তিনি এখানেও যে সঠিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলেন তা আমাদের আশ্চর্য্য করে না—যদি আমরা মনে রাখি যে বিজ্ঞানের কলেজিয় শিক্ষার পরিমাপেও আইনস্টাইন অত্যন্ত মামুলি ছিলেন। সামাজিক চিন্তাধারায় আইনস্টাইন কোন দিকের লোক ছিলেন তা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় তাঁর গোর্কীকে লেখা চিঠিতে "আপনার মতন সৃষ্টিশীল শিক্ষক খুউব অল্পই নিজেকে মানবজাতির কল্যাণকর কাজে এবং যুদ্ধে ব্যপৃত করেছেন নিজেকে যেমনটি করেছেন আপনি। আপনার সৃষ্টি মানুষকে আরো মহৎ করুক, যে রাজনীতিরই তা হোক না কেন। মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের চিন্তা ও কাজের উপরই নির্ভর করবে তাই শেষ বিচারে মানুষকে শিক্ষাদানের প্রশ্নে অনেক বেশী প্রয়োজন সৃষ্টিশীল মনের—রাজনৈতিক নেতাদের থেকেও"[৮] এটা যে কত সত্যি তা তাঁর শতবর্ষের প্রাক্কালে আমরা বিশ্বরাজনীতির দিকে তাকিয়ে যতটা বুঝছি তেমনটি অন্য সময়ে বোঝা যায় নি।

শান্তনু দত্ত

সূত্র:

1. Einstien's philosophy of science—Phillip Frank, Review of Modern Physics (1949) 21 349-355.
2. The Evolution of Scientific thought from Newton to Einstien—Ad' ABRO
3. Maxwell's Influence—Acommenorative volume —A. Einstien.
4. Albert Einstien philosopher scientist—Schilpp (Ed.)
5. Maxwell's Influence—Acommemorative volume —A. Einstien.
6. Einstien On Peace—Otto Nathan.
7. Idid
8. Ibid

Science in India—A Myth or Reality

[কিছুদিন আগে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিষ্ঠাবান গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর পঠন-পাঠন আর গবেষণার আবহাওয়ার অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে বিভিন্ন মহলে স্মারকলিপি পাঠানোয় কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে শো-কজ নোটিশ দিয়েছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক অধ্যাপকদেরকে অথবা ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলোকে কি চোখে দেখা হয় এই প্রবন্ধে তা বিবৃত করা হয়েছে। এখানে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়কে সারা দেশের বিজ্ঞান চর্চার সমস্যারই একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা হ'য়েছে।]

"To keep a scientist working at his most effective and creative level, ..., his morale has to be kept at the highest level,..... It is in the fitness of things that a scientist must be treated with solitude which should be made a part of national concern rather than controversy".

(Dr. Raja Ramanna in Science Today)

This can only be wishful thinking in the present Indian context. Things cannot be otherwise, when dedicated research workers are hounded out of universities, when only stooges are allowed to occupy academic positions, when distinguished scientific workers are served with show-cause notices, when life is made impossible for them in campuses. This is the tale in at least one of the universities in an "enlightened" state of India. Things are not very different in other parts of the country as is clear from the events that took place in the Jawaharlal Nehru University during emergency and those that are taking place in Dibrugarh.

In the University of Calicut some of the dedicated research workers, worried over the deteriorating academic atmosphere, expressed their concern over the turn of events. They sent memoranda to the state authorities and the press. The result was that they were served with show-cause notice by the "higher ups" in the university. The reasons cited were that the research worker failed to follow some of the procedures in sending the memoranda. The research workers were put to great inconveniences by the "higher ups". The show cause notices were withdrawn only when students within the campus and outside brought pressure on the "higher ups" through the government and the chancellor of the university.

The university was established in 1967. In spite of the difficult conditions prevailing in the university —located far away from other academic institutes with no proper accommodation and drinking water supply in the campus—many young and energetic minds came forward, sacrificing prestigious posts and comfortable salaries abroad, in the hope of building a centre of scientific research and training in that part of the country. Their hopes were shattered and in due course they were forced to leave. This naturally caused apprehensions among the small minority of dedicated research workers about their future in the university and the future of the university as a centre of scientific research and training. This is the backdrop of the events that led to the show-cause episode.

Among the men who left the university many were distinguished scientists. Who were they ? Why did they leave ?

Dr. P. J. Ouseph

Dr. Ouseph is a distinguished scientist with exemplary knowledge of physics and chemistry. He has guided two students for Ph. D and has published more than forty papers. He has authored a book "Introduction to Nuclear Radiation Detectors".

He was Professor at Liouville. He joined Calicut University as a Reader in 1975 hoping that he could get the Professorship in Applied Physics which was vacant. The "higher ups" knowing his intentions fully, kept on postponing the interview. This uncertainty was too much for him and finally he decided to leave Calicut in 1976. The day before his departure he was informed of the interview. The interview was held, but the post was never filled. The popular belief is that "their man" could not make the grade.

Dr. Y. S. T. Rao

Dr. Rao is a distinguished physicist. He joined the university in 1975 as a lecturer. He applied for a Reader's Post [two posts were vacant]. The selection was made. Though he stood second, citing certain reservation rules [about which U.G.C. was never informed], the man who stood third was absorbed. The "higher ups" assured him that his case would be considered and certain anomalies in the pay scales would be settled. This was never done. Dr. Rao was disappointed and left Calicut in 1977.

Dr. D. Kannan

Dr. Kannan is an eminent mathematician with more than twenty papers in many areas of physics and mathematics.

Dr. Kannan joined the University as Prof. and Head of the Mathematics Department in 1977. His deep knowledge of the subjects and understanding of academic standards at the post graduate level made him design a new syllabus and the evaluation systems that go with it.

He gained the wrath of the "higher ups" within a short period. He took exception to certain fund allocations made by the "higher ups"—the funds meant for a library in the department of mathematics

were diverted to building purposes. By the time the examination reform discussions were in progress the "higher ups" found him to be the major irritant. The result of all this was that Prof. Kannan started receiving anonymous letters and threats. Life became impossible for him in Calicut. He met the Vice-Chancellor and handed over a strongly worded resignation letter. The students and research workers requested him to reconsider his stand. He changed his mind. He told the V. C. that he would like to replace the resignation letter by a mild protest letter. Also he applied for leave. The understanding was that the syndicate would consider the leave letter and not the resignation letter. But syndicate committed breach of trust and accepted the resignation letter. Kannan left calicut in the first week of September 1978 with a broken heart. His dreams of developing a good department of mathematics in calicut was shattered.

These are only a few important cases, there are many more. What are the forces responsible for making the university what it is today ?

Some instances stand before our eyes as concrete expressions of the attitude of the "higher ups" towards scientific research and training :

When Kannan was leaving the university the students met the V. C. The talks proceeded on the following lines :

V. C.—"Kannan is a brilliant Mathematician. He will not come back. His leave is a settled affair. All brilliant people will go. I have asked my son-in-law not to come to India".

Students.—"Then we will only have stupids remaining in our campus"

V. C.—"It is inevitable".

The Pro vice-chancellor faces the students, protesting on the water supply problem with the following words :

"When you come in the night you have some other intentions. Calling out slogans shows your family background which comes from a gutter".

This distinguished sanskrit scholar considers research fellowships as unemployment allowances ! The role of the registrar in many dealings are well-known.

The attitude of the press and the different employees unions are not any better. When the four research workers were served show-cause notices the Press refused to listen to their version of the story ; syndicate members with proclaimed interest in scientific research did not come to their rescue ; about seventy per cent of the research workers closed their eyes. In the light of these evidences keen observers see some similarities between the intertwining knots at the broader level and at the level of the university. The working at the broader level is very aptly captured by victor. M. Fic :

"..... community organizations functioned as highly disciplined pressure groups taking care of the political, educational, economic and other interests of their members ; they even published their own newspapers and magazines. In fact, they were the very pillars of politics in Kerala,...."

We may be able to find the key to these intertwining knots at the University level in Prof. Kannan's utterance ;

"The basic question is whether I shall continue as a Mathematician or not. In calicut it is impossible."

Is it possible anywhere in India ?

D. Narayana
Indian Statistical Institute

The A Test-Tube Baby 'Controversy'

The Last issue of Vigyan-O-Vigyankarmi carried an article (in Bengali) which included some relevant general comments on the test tube baby controversy. This article, however, did not provide the reader with the technical-scientific background of the issue. We are glad to note that the Bengali magazine 'Parivartan' (পরিবর্তন) in its 1 February, 1979 issue, features an well-written and informative article explaining this technical-scientific background, which should help us assess better the relative merits of the various claims and counter-allegations centred around the test-tube baby experiment in calcutta. From a layman's perusal of this article as well as of some other pieces of technical information we feel that the following observations may be forwarded at the present stage.

Freezing of the embryo at very low temperatures has for quite some time past been discussed as a useful and, in principle, feasible technique in the implantation of externally fertilised egg cells. The technical problems, including the ones of a proper culture medium and suitable means for slow cooling and thawing, have been identified quite clearly. Success has already been achieved in case of lower mammals. A successful breakthrough in case of man has been, so to say, waiting at the threshold in the recent past. It is quite conceivable that the Calcutta scientists have achieved that breakthrough with that combination of skill, daring and luck which sometimes reward investigators with less sophisticated equipments at their disposal. We should not let our inferiority complex allow us to dismiss their claim out of hand and subject them to harassing inquisitions. But, at the same time one expects of the scientists to make known their methods to the scientific community through scientific journals and forums. Instead, they have so long been maintaining a sort of sullen silence which is not helping in any way clear up the doubts and confusions. The talk delivered by one of them at the recent Science Congress session was hardly a report of their own work. The custom, often followed by scientists in works of this type, of circulating preprintes as some sort of advance notification to their fellow-workers, has been ignored. This type of withdrawal from the scientific community only adds to the mutual suspicion and accrimony among the members of that community and generates injuriously false notions among common people.

We cannot but urge upon the scientists involved to come out of their posture of injured pride and hurt dignity, to have confidence on their colleagues, and to discuss their work frankly. Only then will the ferment clear.

A. Lahiri

বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে যন্ত্র লোপাট

দায়সারা অনুসন্ধানের বলি : গবেষকের সুনাম

কলকাতার-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিকাল ইনষ্টিট্যুট থেকে কয়েক বছর আগে এক মূল্যবান ক্যামেরা খোয়া যায়। এর ফলে গবেষণার কাজ, বিশেষত ভ্রূণতত্ত্ব বিভাগের এক অধ্যাপক গবেষকের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং অনুসন্ধানের প্রশ্ন ওঠে। পুলিশের তরফ থেকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর ইনস্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষকে বলা হয় যে, ক্যামেরাটা যে কর্মচারীর হেফাজতে ছিল ক্যামেরা লোপাটের ঘটনায় তাঁর ভূমিকা আছে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং কর্তৃপক্ষ যেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু মামলা দায়ের

করার বদলে একটা অনুসন্ধান কমিটির হাতে ব্যাপারটা তুলে দিলেন। অনুসন্ধান কমিটির ওপর কোন বিরূপ মন্তব্য করা সমীচীন নয়, কিন্তু নথিপত্র থেকে মনে হচ্ছে যে এই কমিটি কোন না কোন ভাবে উক্ত কর্মচারীর সপক্ষে প্রভাবিত হয়েছিল। উক্ত কর্মচারীর কৌঁসুলির বক্তব্যের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ঐ কৌঁসুলি সাক্ষ্য প্রমাণে যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তা কার্যত মেনে নেওয়া হয়েছে, এই বিকৃতির মাধ্যমে ভ্রূণতত্ত্বের উক্ত অধ্যাপক গবেষক শ্রীরতন লাল ব্রহ্মচারীর নামে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে তাও কার্যত নীরব স্বীকৃতি পেয়েছে, আর মোটের ওপর অনুসন্ধান চালানো হয়েছে অত্যন্ত দায়সারা ভাবে। কর্মচারীটি সত্যিই দোষী কিনা, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ এ বিষয়ে রায় দেওয়ার এক্তিয়ার অবশ্যই আমাদের নেই সেটা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই দাবী করতে পারি যে, যে ধরনের প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার দরুন গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি খোয়া যায় তা দূর হওয়া দরকার। দোষী ব্যক্তির—কেউ না কেউ দোষী অবশ্যই—সাজা হওয়া দরকার, আর তার সঙ্গে দরকার গবেষক-অধ্যাপকের নামে মিথ্যা অপবাদ মোচন হওয়া।

সম্পাদক মণ্ডলী

সংবাদ

স্বয়ংশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানাদির কর্মীরা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবংগের বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট সংখ্যক কর্মচারী সাহা ইনষ্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়র ফিজিক্সে এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে "স্বয়ংশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান-গুলির ইউনিয়ন এবং এ্যাসোসিয়েশন সমূহের যুক্ত আন্দোলন কমিটি" গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কমিটির সংক্ষিপ্ত নাম জ্যাকারী (JACARI)।

সংসদ বা রাজ্যবিধান সভার আইন বলে গঠিত মাত্র কয়েকটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন—বিশ্ববিদ্যালয় বা আই-আই-টি ইত্যাদি ছাড়া অধিকাংশ সংস্থাই অবিধিবদ্ধ এবং স্বয়ংশাসিত। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি হয় সোসাইটি অ্যাক্টের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রীকৃত নতুবা কোন চুক্তির মাধ্যমে গঠিত। লক্ষ্য করার বিষয় এই সকল সংস্থায় কর্মী ও নিয়োগকর্তার পারস্পরিক সম্পর্ক আইনের চোখে মনিব-ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন কর্মীর পদমর্য্যাদা যাই হোক না কেন—এই আইন সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। এঁরা কর্মক্ষেত্রে চাকুরীগত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন না।

এই রকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি পশ্চিমবংগের বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যথা বসু বিজ্ঞান মন্দির, সাহা ইনষ্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়র ফিজিক্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ্ সায়েন্স, চিত্তরঞ্জন ন্যাশন্যাল ক্যান্সার রিসার্চ সেণ্টার এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও CSIR, ICAR এবং ICMR অধীনস্থ সব সংস্থাতেই চলছে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে শিল্পের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হওয়ার পরেও কর্মীদের অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি এবং কোন রকম কারণ না দেখিয়ে কোন কর্মীকে ছাঁটাই করার অধিকার এখনও অব্যাহত রয়েছে।

বিভিন্ন ধরণের পুঞ্জীভূত তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানাদির সর্বস্তরের কর্মীগণ একত্রিত হতে আরম্ভ করেছেন। উদ্দেশ্য —আইনগত সুযোগ পাওয়া, সুশাসিত গবেষণা সংস্থাগুলির কাঠামো গণতন্ত্রীকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মী-সংস্থা গঠনের অধিকার লাভ। উপরোক্ত দাবীসমূহ আদায়ের উদ্দেশ্যে কনভেনশনে যৌথ আন্দোলন কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাহা ইনষ্টিটিউটের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এবং বাইরে অপেক্ষমান কয়েক শত কর্মীর উপস্থিতিতে কনভেনশন সুরু হয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু বলেন যে সাধারণ মানুষের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কর্মী সাধারণ এটা বুঝতে পেরেছেন। একজন কর্মী তিনি কারখানায়, শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানেই কাজ করুন না কেন, তাঁর গণতান্ত্রিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থাকা উচিত। অতীত দিনের স্বৈরাচারী শাসনের ভয়ংকর দিনগুলির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু বলেন যে তখন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা এবং কর্মীদের ন্যায্য দাবী দাওয়া নস্যাৎ করা হয়েছিল।

শ্রীজ্যোতি বসু আরও বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে শিল্প সম্পর্ক বিল নতুন করে তৈরী করে পেশ করুন। এই বিলে গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে তিনি আশ্বাস দেন, বামফ্রন্ট সরকার স্বশাসিত গবেষণা সংস্থায় কর্মীদের আন্দোলন সমর্থন করবে এবং এ বিষয়ে

প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমাদের দেশে গবেষণা বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও নীট ফল যে প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম, এই কনভেনশনে তা তুলে ধরা হয়। এর কারণ, যদিও জনগণের পয়সায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্বাহিত হয় প্রকৃতপক্ষে এ সংস্থাগুলির পরিচালনভার ন্যস্ত হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। অন্যায়, ভয়ভীতি দেখানোর কোন সীমা পরিসীমা নেই বল্লেই চলে। তাই কর্মীরা তাঁদের কাজে কোন উৎসাহ বোধ করেন না এবং প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় তাঁদের কোন ভূমিকা আছে মনে করেন না। স্বভাবতঃই জনসাধারণের কাজে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। এ কনভেনশন তাই দাবী করেছে —বিজ্ঞানী ও অন্যান্য কর্মীদের নিজ নিজ সংগঠনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান পরিচালন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যেকটি সংস্থার কাঠামো গণতন্ত্রীকরণ করতে হবে।

শ্রীবসুর পর সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিজ্ঞানকর্মীদের প্রস্তাবিত আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন শ্রীহরিপদ ভারতী ও শ্রীদীপেন ঘোষ।

সবশেষে কনভেনশনে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও কর্মীদের স্বার্থের পরিপন্থী শিল্প সম্পর্ক বিল বাতিল করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই কনভেনশন যে প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে, অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থাও তার অংশীদার ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বিজ্ঞানকর্মীদের এই আন্দোলনে সাধ্যমতো উদ্যোগগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Report on the Seminar on Appropriate Technology for Rural Development

Much of the woes, disparities and lack of progress of our country can be attributed to a technology that is totally unsuited for our needs. With this idea in view the West Bengal Science and Technology Committee organised a Seminar last February on Appropriate Technology for Rural Development. The speakers were acknowledged experts, though the basis for the selection of the other participants was not very clear—perhaps no such clear cut criterion existd in the minds of the organisers.

The presentation of Dr. M. P. Parameswaran and Prof. A. K. N. Reddy were very interesting, probably because of their firsthand pioneering experiences, and also reflected the spirit of the proceedings. The others ranged from good to indifferent.

Prof. Reddy said that rural underdevelopment is a result of indiscriminate application of imported sophisticated technology. It has created an urban elite and has neglected the rural poor. The fact that it is inappropriate is borne out by the results. According to R. N. Bhattacharya Appropriate Technology (AT) is one that gives the optimum balance between the felt needs of the people and the available resources. It utilizes the indigenous resources of abundant man power and produces items of mass consumption instead of luxury goods. It is not primitive technology but a scientific method of maximising labour and minimising capital.

Dr. Parameswaran was in the opinion that AT is not just the building of a few gadgets but he has extended the concept to the fields of Agriculture, Industry, Health, Education, Transport and Administration. AT will not fetch the desired result of rural upliftment unless the poorer sections get the control over the technology. Dr. D. K. Bose suggested that AT can even have the effect of helping the rich peasants while bypassing the poorest. A drastic social change is the prerequisite for the meaningful implimentation of AT. The problem is a social one and not technological, but scientists and technologists can contribute to initiate the change. Prof. Reddy warned that this view is often used by some as an alibi to remain inactive. He goes on to talk about a methodology of Rural Development through AT, where the stress is on the upgrading of the traditional technologies by scientific means. He gave an exposition of the work being carried out by ASTRA in an extension centre amidst rural surroundings.

Prof. N. R. Dhar's paper dealt with Nitrogen Transformation. He showed how organic fertilizers can compete and even surpass chemical fertilizers and yet be much cheaper and more appropriate for the Indian conditions.

A talk on the Application of Cryogenic Technology after an ample lunch had a soporific effect on the participants.

On the whole, the seminar has exposed the participants to the various aspects of AT. It should be regarded as a small initial step towards a far-away goal.

T. Banerjee

পুস্তক পরিচিতি

বিগন গডমেন ! ॥ ডঃ আব্রাহাম, টি, কভুর ॥ সম্পাদনা : ভি.এ. মেনন
জায়কো প্রেস প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৯৭৬ ॥ পৃঃ ২০০ ॥ দাম : ৮ টাকা

গোটা দেশের দেওয়াল জুড়ে যখন 'বাবা নাম', ঘর জুড়ে হাওয়া বাবা, ফুয়াবাবার রাজত্ব, লকেট জুড়ে দাদাজী, পিতাজী আর মাতাজীর ছবি, একের পর এক গুরুজী যখন তাদের প্রদর্শিত পথে মুক্তির দাওয়াই বাতলাতে ব্যস্ত তখন কভুরের 'বিগন গডমেন !' বইখানি নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। আধ্যাত্মবাদ, গুরুবাদের যে শেকড় ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের মাটিতে বহুযুগ ধরে প্রোথিত আছে কভুর তা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়েই নয়, সারা জীবনের অক্লান্ত শ্রমসাধ্য গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েও। বিগত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছেন তাঁর 'কেসবুক' নামে দিনলিপিতে যার থেকে এই বইটি সম্পাদনা করে ভি. এ. মেননও নিঃসন্দেহে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

আঠাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বইটিতে 'ঈশ্বরচিন্তা', 'পুনর্জন্ম', 'জ্যোতিষশাস্ত্র', 'ভ্রান্ত-অনুভূতি', 'সমাধিতে সিদ্ধিলাভ', 'বাইবেল : নৈতিক অবনতির পথপ্রদর্শক' ইত্যাদি পরিচ্ছেদে লেখক এই সমস্ত প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানচিন্তা বলিষ্ঠভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন আর অন্যান্য পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করেছেন আধিভৌতিক, অলৌকিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাসমূহ। পাদরীকুল, ধর্মযাজক আর গুরুদের ঈশ্বরচিন্তার পেছনে যে নির্বুদ্ধিতা, ভণ্ডামী ও লোক ঠকানোর শয়তানি কাজ করে থাকে তাই তিনি বস্তুবাদী চিন্তার আলোকে তুলে ধরেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মোড়কে বৈজ্ঞানিক আবরণ দেওয়ার অসাধু প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন লেখক, এ ছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন মানুষের জন্ম সম্পর্কিত তথ্যকে পাশ কাটিয়ে কেমন করে পুনর্জন্মের মত বস্তাপচা তত্ত্বকে প্রচার করা হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (যেমন, জীববিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ইত্যাদি) আলোকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক ঢঙে লেখক তুলে ধরেছেন আধ্যাত্মবাদ, মায়াবাদ, পারলৌকিক চিন্তা ও গুরুবাদের দেউলিয়াপনা।

স্কুলে বাইবেল শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন কভুর, দেখালেন বাইবেলের আপাতপবিত্রতার আড়ালে যে সমস্ত নীতি নৈতিকতা ও আচরণবিধির অনুমোদন আছে তা ছাত্র ও যুবসমাজকে কেমন করে অতি সহজেই বিপথে চালিত করতে পারে। অসততা, মিথ্যাচার, অসহিষ্ণুতা, যথেচ্ছ যৌনাচার, দাসপ্রথার সমর্থন ইত্যাদি ধিক্কারজনক দুর্নীতির প্রশ্রয় যে বাইবেলে আছে তা তিনি বাইবেল থেকেই উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। লেখক শানিত আক্রমণ চালিয়েছেন গুরুবাদ-বাবাবাদের বিরুদ্ধে এবং এদের আসল চেহারাটি তুলে ধরে জনমানসে এদের ভাবমূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে নিশ্চয়ই একটি বড় ভূমিকা পালন করবেন। একদিকে সর্বকনিষ্ঠ গুরুমহারাজজীর চোরাই চালানের কেলেঙ্কারী ফাঁস করে, অন্যদিকে বিদেশীনি শিষ্যার প্রতি মহেশ যোগীর অশালীন আচরণের প্রতিবাদে 'বিট' শিষ্যদের মহর্ষির সঙ্গ-পরিত্যাগের কাহিনী তুলে ধরে লেখক এদের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত করেছেন। এরই সাথে তিনি শ্রীসত্যসাইবাবার মিথ্যা মহিমা প্রচারের তথ্য ফাঁস করেছেন। সাইবাবার এই সব ফেরীওয়ালাদের দলে আছেন বাঘা বাঘা তকমা আঁটা বিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে পয়লা নম্বর চ্যলা ডঃ ভগবন্তমের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদে ডঃ কভুর সপ্রমাণ দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন কেমন করে বাবা মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এরা এই সব গল্প ফেঁদে থাকেন। লেখকের মতে এই সব বাবার দল অর্থহীন, ঝকঝকে কথার জাল বুনে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন অসহায় দুর্বল মানুষের মন কেড়ে নেয়। এদেরকে এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন লেখক ঘোষণা করেছিলেন এক

লক্ষ টাকার পুরস্কার। স্বাভাবিক কারণেই "সাক্ষাৎ ভগবানে"রা এই পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে প্রমাণ করেছে তাদের অতিমানবীয়তার দাবী কতটা ভুয়া।

অন্যান্য পরিচ্ছেদে বিভিন্ন অলৌকিক, আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে অসহায়, দুর্বলমানুষেরা তান্ত্রিকতা, ঝাড়ফুক, ওঝাগিরি ও ভেল্কিবাজীর কাছে আত্মসমর্পন করে। বইটি থেকে কয়েকটি নজীর এখানে তুলে ধরা হচ্ছে : 'মাণ্ডাইটিভুর সাঁকিলিভৈরান' নিবন্ধে লেখক তুলে ধরেছেন কেমন করে মাণ্ডাইটিভুর একটি সাত বছরের মেয়ে সাঁকিলি ভৈরানের (শ্রীলঙ্কার অপদেবতা) পাল্লায় পড়ে আর এই "অপদেবতাকে" হঠিয়ে দেওয়ার ভুয়া দাবীতে ব্যপক যাগযজ্ঞের ক্রিয়া কলাপে একজন "যোগী" কিছু ভেল্কি দেখায়। পরে কভূর নিজে উপস্থিত লোকজনের সামনে ঐ একই ভেল্কি দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে "যোগী"টি আসলে ঠগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'যাদু-আরোগ্য' নিবন্ধে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন জাফনা স্কুলের কৃতী ছাত্রী সরস্বতীর করুণ কাহিনী আর সেই সুযোগ নিয়ে এক সাধুর জোচ্চুরীর কাহিনী। 'লতা ও তার রহস্যজনক প্রেমিক'-এ লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কিশোরী লতা তার কল্পপ্রেমিকের বাসনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেমন করে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে লেখক সাহায্য করেন। ওলুমাড়ুর দাবানল যে কাদেরী গাছে আশ্রয়গ্রহণকারী ফাঙ্গাসের আলোকবিকীরণ থেকেই হয়ে থাকে এবং কেমন করে এই সমস্ত ঘটনার সাথে "অপদেবতার" সম্পর্ক সহজেই গড়ে তোলা হয় ও তা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তাই লিপিবদ্ধ করেছেন কভূর "ওলুমাড়ুর দাবানল" নিবন্ধে।

আমাদের মত দেশে যেখানে প্রচলিত বিশ্বাস আর কুসংস্কার শেকড় গেড়ে বসে আছে, যে দেশের জল-হাওয়ায় অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আধ্যাত্মবাদ, গুরুবাদের প্রশ্রয় আছে সেখানে কভূরের 'বিগন গভমেন' বইটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান অবদান হিসেবে গণ্য হবে এবং বিজ্ঞানকর্মী তথা সাধারণ মানুষকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি দিশা খুজে পেতে সাহায্য করবে।

বইটির সম্পাদনার কাজে একটি অগোছালো ছাপ থেকে গেছে—আরও সুগ্রথিত হলে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মূল সুরের ঐক্য ছাড়াও বিন্যাসের পর্য্যায়ক্রমটি স্পষ্ট হত। কভূর একেবারে বাস্তব ঘটনাবলীর সাহায্যে ভাববাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হলেও যে সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে এই হাজার বছরের পুরোণ অবক্ষয়ী মূল্যবোধ সেই কাঠামোর বিশ্লেষণে তিনি প্রয়াসী হন নি, কিন্তু তাও বস্তুবাদের এই অবিচল সংগ্রাম মানুষের প্রগতি ও মুক্তির পথে পাথেয়স্বরূপ হয়ে থাকবে।

পার্থ সেন

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সমীপেষু,
মহাশয়,

এই সংখ্যায় নদী পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগল। বস্তুতঃ আগামী মরশুমে বন্যার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার অন্ততঃ সাময়িক ব্যবস্থা করতে হলেও এখন এই শুখা মরশুমেই কাজ শুরু করতে হবে। অতএব প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আশা করি আগামী সংখ্যাগুলিতে প্রবন্ধটি চলবে।

যুগে যুগে ব্যক্তিস্বার্থ কিভাবে জল নিয়ন্ত্রণকে বিকৃত করেছে, তার ইতিহাস, প্রথমবারে তুলে ধরে লেখক-ত্রয় ভালই করেছেন। এতে ব্যর্থতার পটভূমিকাটা বুঝতে সুবিধে হবে। এই ব্যাপারে কয়েকটি অন্য উদাহরণ আপনার মাধ্যমে লেখকত্রয়ের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই। টেনেসী উপত্যকা প্রকল্প এবং দামোদর উপত্যকা প্রকল্প উভয় ক্ষেত্রেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনই ছিল লক্ষ্য। কপিলবাবুও বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাস্তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের potentialকে অনেকাংশেই অব্যবহৃত রাখা হয়েছিল। একটি বামপন্থী পত্রিকায় পড়ছিলাম, ভারতকে শিল্পে অনুন্নত রাখার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসেরই এটা ফলশ্রুতি। কিন্তু যে স্তরে সাম্রাজ্যবাদ পণ্যের পরিবর্তে মূলধন রপ্তানী করাকে তাদের মূল নীতি করেছে, সেই যুগে এটা খাপ খায় না। কয়লাখনি মালিকদের সঙ্গে close কারুর কাছে শুনেছিলাম, এই potential অব্যবহৃত রাখার পিছনে খনি মালিকদের হাত ছিল। মনে রাখতে হবে সেই সময়ে বিদ্যুতে অধিক উৎপাদনের সমস্যা ছিল, জলবিদ্যুৎ এসে তাপ বিদ্যুৎকে হটিয়ে দেওয়ার সমস্যা ছিল এবং খনি জাতীয়করণের কোনো গল্পই তখনও শুরু হয় নি। কাজেই খনি মালিকদের হাত থাকার গুজব ভিত্তিহীন নাও হতে পারে।

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ পূর্ব অংশের জোতদাররা চিরদিনই শক্তিশালী, বাঁকুড়া জেলা তাই সেচ খালের ব্যাপারে রয়ে গেল বঞ্চিত। অবশ্য বেশী সেচ খাল হলেই সঞ্চিত জলের পরিমাণও বাড়াতে হয়। আর জলাধার নির্মাণ তো মহা রাজনৈতিক যুদ্ধের কারণ হয়। জলাধার প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে বিশেষজ্ঞকৃত একটি পরিকল্পনাকে (যাতে

কয়েক হাজার একর ধান জমিকে প্লাবিত করার কথা ছিল) বিপ্লবী বিদ্রোহীরা নাকচ করে জলাধারটিকে পাহাড়ের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল, প্রাকৃতিক দেওয়ালের সঙ্গে কিছু কৃত্রিম দেওয়াল তুলে (সম্ভবত অনেকটা যেমন করে আমাদের দেশে সিঞ্চল হ্রদ তৈরী করা হয়েছে)। অবশ্যই এরকম সুবিধে সর্বত্র থাকে না তবে জলাধারগুলি যত উপরে করা হবে ততই কম এবং নিচু মানের জমি নষ্ট হবে। রায় মন্ত্রীসভা পুরুলিয়ার মতন অতি উর্বর অঞ্চলে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এক বিশাল জলাধার নির্মাণ করে নিম্ন অঞ্চলের বন্যা রুখতে চেয়েছিলেন। এই প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার আমার মতে অত্যন্ত যুক্তিসম্মত কাজই করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-বিহার চুক্তির ফলে হয়ত উচ্চ অঞ্চলে জলাধার নির্মাণের সমস্যা কিছু কমবে।

Dredging ব্যয়সাপেক্ষ (?) বলে জলাধারগুলি তৈরী হয় পাড় বাঁধ (embankment) দিয়ে এই বাঁধ আমেরিকার এবং ভারতের গ্রামবাসীর কাছে (interestingly) রাস্তার সঙ্গে synonymous-এর থেকে বোঝা যায় সর্বত্রই এই বাঁধ রাস্তা হিসেবে এবং রাস্তা বাঁধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাস্তা ও বাঁধ যেহেতু সরকারের দুইটি "স্বাধীন" বিভাগের অধীনস্থ অতএব উভয় প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো সম্ভব নয়। এতে যে কি বিপুল অর্থের অপচয় হয় তার ইয়ত্তা নেই। রাস্তার তলা দিয়ে জল নির্গমনের পথ রাখতে হয়। উপর দিয়ে কাঠের সেতু করতে হয়। তা ফি বছর ভাঙে এবং গড়তে গিয়ে contractorরা কিছু ব্যবসা করেন (এ বছর কিছু ব্যত্যয় ঘটছে, concrete সেতু হচ্ছে।)

মাটির পাড় বাঁধগুলির দু'পাশে বাঁশ শাল চাষ করলে ভূমিক্ষয় বন্ধ হয় এবং মাটি লোহার মতন শক্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। গত সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ রাতে ঘাটাল দাসপুরের বিধ্বংসী বন্যার কারণ ছিল একাশী মৌজার বাঁধে ফাটল। এই ফাটল হয়েছিল হরি সিং পুরে। দু'বছর আগে আমি সেখানে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম যে ঐ বাঁধের অন্য সর্বত্র স্বাভাবিক গাছপালা আছে কিন্তু শুধু ঐ জায়গাটিই ন্যাড়া। ঘটনাচক্রে ঐখানেই ফাটল ধরল।

তা এখন বাঁশ, সাল ইত্যাদি দিয়ে afforestation যে ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ তা কি মহাপণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা জানেন না? কোন স্বার্থে তাহলে afforestation শুধু বনমহোৎসবের বক্তৃতায় এবং প্রাক্তন rising son এর চারদফায় সীমাবদ্ধ রইল? কার্যতঃ হয় শুধু brick work যাতে অগাধ অর্থব্যয় হয়, প্রতি বছর ভাঙে আর কি হয় সেটা vigilance commission এর জ্ঞাতব্য।

পাড় বাঁধ যখন ভাঙল তখন আমরা খানাকুলবাসীরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম যে আমরা অরক্ষিত এলাকায় বাস করি। অরক্ষিত এলাকা খানাকুলে প্রতিবছরে এক মাস ধান গাছ জলে ডুবে থাকে (এবং মরে), দিন আট দশ বেতার ছাড়া সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে, রাস্তার ওপর নৌকো চলে কিন্তু সুরক্ষিত অঞ্চলের মতন দশ ফুট উঁচু জল এসে সবাইকে হঠাৎ ডুবিয়ে দেয় না। প্রসঙ্গতঃ ধান গাছ, দিন পাঁচ সাত জলে ডুবে থাকলে মরে না। বরং পলি পড়ে ফলন বাড়ে। তবে অফিসাররা সরকারী আবাস ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছেন, দৃশ্যটা বড় হৃদয়বিদারক। সরকার কি অফিস ও আবাস তিন চারতলা বাড়ীতে করতে পারেন না। নাকি গ্রামে তিন চারতলা বাড়ী করলে গ্রামের লোকের আস্পর্ধা বড় বেড়ে যাবে—তারা আর কলকাতাকে সম্মান করবে না? [এ বছর সরকার গ্রামে আশ্রয়স্থল-cum-প্রাথমিক বিদ্যালয় দোতলা বাড়ী বানাচ্ছেন]

Dredging এর নাম শুনলেই Irrigation officer মাত্রই কেন জানি না খেপে যান। ভীষণ খরচ, অবাস্তব, এক ঘণ্টায় আবার ভর্তি হয়ে যাবে ইত্যাদি। ড্রেজারগুলি এখনো তোলা পলির শতকরা নব্বই ভাগ নদীবক্ষে পুনর্নিক্ষেপ করে। এটা কবে থেকে বন্ধ হবে? এছাড়া যেভাবে স্থায়ী dredger বসিয়ে গঙ্গার পলি দিয়ে লবণহ্রদ ভরাট করা হয়েছিল, সেভাবে কি মোহনা, নদী সঙ্গম ও বাঁক ইত্যাদি পলি prone স্থানে স্থায়ী dredger বসালেও খরচটা forbidding থাকবে? বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক মোটরে যেহেতু ডিজেলের সিকি মাত্র খরচ পড়ে।

হয়ত পরবর্তী সংখ্যায় এইসব আলোচনা এমনিতেই আসত, তবু একটু মনে করিয়ে দিলাম।

নমস্কার সহ

কল্যাণ কুমার দেব
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
রামমোহন কলেজ, খানাকুল

॥ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার আবেদন ॥

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় বিজ্ঞানের বিকাশ ও ভূমিকা সম্পর্কে একটী অনুসন্ধানমূলক কাজ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা অতি সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ভাবনায় এই বিষয়টিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে এগোনো হবে—যেমন, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কারিগরিবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ইত্যাদি। এই বিষয়ে উৎসাহী সকলকেই আমরা আহ্বান করছি এগিয়ে আসতে তা তিনি সদস্য হোন অথবা সদস্য নাই হোন। উৎসাহী বন্ধুরা যোগাযোগ করবেন প্রতি সোমবার সংস্থার অফিসে (৫২/৯সি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২) অথবা সংস্থার সম্পাদকের সঙ্গে (ডঃ রবীন মজুমদার, ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, ৯২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯)

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।